২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে

প্রাথমিকস্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের কয়েকটি দিক

সংক্ষেপিত সমন্বিত সপ্তম মডিউল বা প্রশিক্ষণ সম্ভার

সহযোগিতায়
ইউনিসেফ, প: ব: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, প: ব: রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, প: ব: বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

৮৪, শরৎ বসু রোড • কলকাতা ৭০০ ০২৬

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রাথমিকস্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজকর্মের মাধ্যমে বিজ্ঞান শেখা ও শেখানোর পদ্ধতির প্রয়োগ প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণ কর্মশালার চারটি পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ প্রধানতম সম্পন্ন ব্যক্তিদের ও মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিমুখীকরণ সাফল্যের সংগে শেষ করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ জেলার সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিমুখীকরণের কাজ শুরু হতে চলেছে, শিক্ষিকা/শিক্ষকদের অভিমুখীকরণের কাজও ২০০১ সালের মধ্যেই দ্রুত শেষ করবার প্রচেষ্টা হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ হাতে-কলমে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রকৃতি বিজ্ঞান হাতে-কলমে শেখা ও শেখানোর (বা সক্রিয়তাভিত্তিক) এই কাজটি শেষ হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। সেক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রকৃত অর্থেই সার্থকতা লাভ করবে। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীলতা, উদ্দেশ্যমুখীনতা, প্রশ্ন করার সাহস ও নান্দনিক চেতনার বিকাশ সুষমভাবে ঘটবে। কাজই জীবন-জীবনই কাজ আর কাজের মধ্যেই আনন্দ। এই উপলব্ধি শিশুশিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।

যে জেলাগুলিতে ডি.পি.ই.পি-র কার্যক্রম চলছে সেই জেলাগুলিতে ডি.পি.ই.পি প্রণীত ও পর্যদ অনুমোদিত শিক্ষাবিজ্ঞানের সপ্তম মডিউলের উপর অভিমুখীকরণের কাজ শেষ হয়েছে। ডি.পি.ই.পির কার্যক্রম যে জেলাতে চলছে না সেই জেলাগুলিতে এই কাজ এখনও বাকি রয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞানের যে যে বিষয়গুলি সহায়ক এই শিখনসম্ভারে সেই বিষয়গুলিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে সপ্তম মডিউল থেকে কিছু অংশ বেছে নেওয়া হয়েছে। এই নির্বাচিত অংশগুলি প্রকৃতিবিজ্ঞানের হাতে-কলমে কাজকর্মের সংগে কর্মসূচি অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের কাছে তুলে ধরা হবে। কিন্তু হাতে-কলমে প্রকৃতিবিজ্ঞান শেখা ও শেখানোর কাজ যাতে কোনমতেই ব্যাহত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এই কর্মশালাগুলি হবে ৬দিনের।

আশা রাখি শিক্ষাবিজ্ঞানের নির্বাচিত এই অংশটুকু থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী-রা প্রকৃতই উপকৃত হবেন এবং সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই অভিমুখীকরণ কর্মশালা সফল হবে।

অধ্যাপক ড. জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান পঠন-পাঠন বিষয়ক ৬ (ছয়) দিনের অভিমূখীকরণ কর্মশালা

কর্মসূচি (শুধুমাত্র ডি.পি.ই.পি বহির্ভূত জেলাগুলির জন্য)

প্রথম দিন

সকাল ১০.০০ - ১১.০০	:	সম্পন্ন ব্যক্তিদের পঞ্জীকরণ।
১১.০০ - ১২.৩০	:	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
১২.৩০ - ০১.০০	:	প্রকৃতিবিজ্ঞান পঠন-পাঠন বিষয়ক প্রশিক্ষণ : প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাধারা এবং কাজকর্মভিত্তিক পঠন-পাঠনের ধারণা এবং এর উপযোগিতা।
০১.০০ - ০২.০০	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি।
০২.০০ - ০৪.০০	:	শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা: (১) শিখন। (২) শিশু নিরীক্ষণ — শিশুকে চেনা ও জানা।
০৪.০০ - ০৫.০০	:	প্রকৃতিবিজ্ঞান — কর্মশালা পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা এবং সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের জন্য দলবিভাজন।

দ্বিতীয় দিন

সকাল ১০.০০ - ০১.০০	:	শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা : (১) শিখনের নানা পথ, নানা ভঙ্গি। (২) শেখার কাজটি কি সরলরৈখিক এবং ক্রমসমষ্টিমূলক ? (৩) কোন পরিস্থিতিতে শিখন যথোপযুক্তভাবে সম্পন্ন হয়? (৪) শিখনের বাধা — কঠিন অঞ্চল।
০১.০০ - ০২.০০	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি।
০২.০০ - ০৫.০০	:	প্রকৃতিবিজ্ঞান : হাতে-কলমে কাজ আরম্ভ শুরু।

তৃতীয় দিন

সকাল ১০.০০ - ০১.০০	:	প্রকৃতিবিজ্ঞান : হাতে-কলমে দলভিত্তিক কাজ চলবে।
০১.০০ - ০২.০০	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি।
০২.০০ - ০৫.০০	:	প্রকৃতিবিজ্ঞান : দলভিত্তিক কাজ চলবে।

চতুর্থ দিন

সকাল ১০.০০ - ০১.০০	:	শিক্ষাবিজ্ঞান : (১) শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে। (২) ভাষা শিখন। (৩) ভুলের প্রসঙ্গে। (৪) সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন।
০১.০০ - ০২.০০	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি।
০২.০০ - ০৫.০০	:	শিক্ষাবিজ্ঞান : আলোচিত বিষয়ের উপর প্রতিবেদন রচনা, পেশ ও আলোচনা।

পঞ্চম দিন

সকাল ১০.০০-০১.০০	:	প্রকৃতি বিজ্ঞান : শ্রেণী বদল করে দলের কাজ চলবে।
০১.০০-০২.০০	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি
০২.০০-০৪.০০	:	প্রকৃতি বিজ্ঞান : দলভিত্তিক কাজ চলবে।
০৪.০০-০৫.০০	:	দলভিত্তিক প্রতিবেদন রচনা ও পেশ

ষষ্ঠ দিন

সকাল ১০.০০-০১.০০	:	পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবিত কাজকর্মের সুপারিশ দলে বিভক্ত হয়ে কাজ
০১.০০-০২.০০	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি
০২.০০-০৪.০০	:	প্রতিবেদন পেশ- নমুনা। উদ্ভাবিত সামগ্রীর প্রদর্শন ও প্রয়োগ
০৪.০০-০৫.০০	:	সমাপ্তি অনুষ্ঠান

শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

শিখন

সব স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই রয়েছে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলার অসীম সম্ভাবনা। সম্ভাবনাময় মানুষের অন্তরে নিহিত আছে যুক্তিনিষ্ঠ শিক্ষাভাবনা। শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীর অন্তরের ভাবনাগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটানোই হল এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

চারটি মূল নীতির দিকে লক্ষ রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি রচিত হয়েছে। এগুলি হল: (ক) শিশুকেন্দ্রিকতা (খ) সক্রিয়তা (গ) সমাজকেন্দ্রিকতা ও (ঘ) আনন্দময়তা।

শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক করে তোলার জন্য দরকার শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া, প্রবণতা ও মানসিক ক্ষমতা সম্বন্ধে শিক্ষকের সম্যক ধারণা। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসে শেখার বিষয়টি। শেখা বা শিখন হল একধরনের মানসিক প্রক্রিয়া বা মনের কাজ।

দৈহিক ও মানসিক পরিণতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর শিখনের কাজ এগিয়ে চলে। লক্ষ করা গেছে যে শিশু স্বকীয় প্রচেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখে। শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিশুকে শিখতে সাহায্য করা। শিশু চলে আপনভাবে। তার স্বাভাবিক প্রবণতায় বাধার সৃষ্টি হলে স্বাভাবিকভাবেই সে একটু বেঁকে বসে। পুনরাবৃত্তিমূলক বা যান্ত্রিক প্রকৃতির শিখন পূর্ণাঙ্গ নয়। এই কাজকে শিখনের সোপান হিসাবে বিবেচনা করা যায়। বিশেষ যান্ত্রিক প্রকৃতির শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শিখন কী?

শিখন বা শেখা হল মনের একধরনের স্বাভাবিক কাজ। অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হল শিখন। শিশুদের শিখনের স্বাভাবিক ধারা অবলম্বনেই তাদের শিখতে সাহায্য করা দরকার। শিশুর মধ্যে রয়েছে সহজাত কৌতূহলপ্রবণতা। সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুরই মধ্যে অর্থ খুঁজে পেতে চায়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে শিশু কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে নিজের সামর্থ্য বাড়ায়। এরই ফলে সে নিজের

আচরণসমূহকে ও তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এই স্তরে শিশু অন্যেরা যা করে, তা অনুকরণের মাধ্যমে করতে চেষ্টা করে। শিশুদের মন হয় উন্মুক্ত, গ্রহণোন্মুখ ও প্রত্যক্ষণে পারদর্শী। তার চারিদিকে যে অজানা, বিহ্বলকারী ও জটিল পরিবেশ রয়েছে তার থেকে শিশু নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় না। শিশু এই পরিবেশকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে ও নিজেকে তার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। শিশু তার নিজস্ব ভাবধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। সে তার চারিদিকের পরিমণ্ডলকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করেই ক্ষান্ত হয় না। নিজের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিবেশের বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বা সংবেদন লাভে সচেষ্ট হয়। হাতের কাছে যা পায় সে তা স্পর্শ করে, বাঁকায়, ভাঙে ও নানাভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। লক্ষ করা যায় যে শিশুরা স্বাভাবিকভাবে সাহসী, ধৈর্যশীল ও ভুলভ্রান্তিতেও অবিচল। অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তির মধ্যে অবিচল থাকার ক্ষমতাও শিশুর মধ্যে অনেক বেশি। কোনও নতুন জিনিসের বা নতুন পরিস্থিতির অর্থ উপলব্ধির জন্য শিশুর মধ্যে তাগিদ থাকে। এই তাগিদ থাকা সত্ত্বেও শিশু ব্যস্ত হয়ে ওঠে না, ধৈর্য হারায় না। দুনিয়ার যাবতীয় বিস্ময় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে ক্রমশ শিশুর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। শিশু জানার জন্য চেষ্টা করে ও অপেক্ষা করে। অনেক সময়ে খুব ধীর লয়ে হলেও শিশু পরিণামে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে ফেলে। শিশুর শেখার জন্য যে চেষ্টা তাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শেখা হল জানা, করা, হওয়া ও একত্রে বাঁচার এক প্রক্রিয়া। এজন্য শিশুর ক্ষেত্রে শেখার কাজটি হওয়া দরকার অভিজ্ঞতাভিত্তিক। নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে গতানুগতিকতামুক্ত অবস্থায় শিশু শিখবে তার নিজস্ব প্রচেষ্টায়। শিশুর শিখন বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য তার প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্যায়ের আচরণগুলির প্রতিও আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। কোন শিশুই শূন্যমনে বিদ্যালয়ে আসে না। শিশু যখন স্কুলে আসে তখন স্বকীয় প্রচেষ্টায় তার জ্ঞানমূলক শিখন অনেকটাই হয়ে থাকে। শিশু তার ভাষায় ব্যাকরণকে সহজাতভাবে কথাবার্তায় ব্যবহার করে। ছোট, বড়, হালকা, ভারী, অর্ধেক, গোটা ইত্যাদি বিষয়েও তার ধারণা থাকে। এই ধারণাগুলি সঙ্গে করেই সে স্কুলে আসে। তার মনের সঙ্গে পরিবেশের যে দেওয়া-নেওয়া চলে তার থেকেই সে এইসব ধারণা গড়ে তোলে। এই ধারণাগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্পষ্ট অগোছালোভাবে আসতে পারে। শিশু যখন কিছু শেখে তখন সে বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করার জন্য, তাকে বিশ্লেষণ করার জন্য, তা থেকে সিদ্ধান্তে আসার জন্য এবং তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলীর প্রয়োগ করে। সে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার অধিকারী। শিশু যে কোনো পরিস্থিতির সরাসরি মুখোমুখি হতে চায় এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে শিখে নেয়।

শিক্ষক মহাশয়ের উচিত শিশু তার মতো করে যা জানে তাকে মর্যাদা দেওয়া। তিনি উপলব্ধি করবেন যে শিশু স্কুলে আসার সময় কিছু না কিছু জেনে আসে। সেক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে এবং তিনি কৌতূহলী হবেন। তিনি তখন মজার মজার চ্যালেঞ্জপূর্ণ শিখন পরিস্থিতি তৈরি করবেন আর শিশুরা সেগুলিতে অংশগ্রহণ করবে।

স্কুলকে শিশুর কাছে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে করে তুললে চলবে না। বিষয়বস্তু না বুঝেই অনেক সময় শিশুরা পাঠ্য বিষয় মুখস্থ করে থাকে। এমনভাবে পাঠ্যবই ব্যবহার করা দরকার যাতে শিশু চিন্তা করার সুযোগ পায় ও তার সুপ্ত দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারে।

শিক্ষক মহাশয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলিকে নিয়ে সুন্দর ও সৃজনশীল সক্রিয়তাভিত্তিক কৃৎ-কৌশল প্রস্তুত করে তাদের কাছে উপস্থাপনা করবেন।

(১) হাতে-কলমে কাজের মধ্যে মজা থাকবে।

(২) কাজগুলি শিশুর বোধগম্যতার স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(৩) কাজের মধ্যে থাকবে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ।

(৪) কাজগুলি শিশুদের চিন্তা করতে ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে।

(৫) হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে শিশুরা একে অপরের কাছ থেকে শিখবে।

(৬) সব শিশুই কাজে অংশগ্রহণ করবে।

(৭) প্রয়োজনে শিক্ষক শিশুদের সাহায্য করবেন ও নির্দেশনা দেবেন।

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে শিখনের প্রধান ক্ষেত্র মন। ধারণা বা জ্ঞান অর্জনের জন্য মনকে কাজ করতে হয় অনেক বেশি। তাই এই কাজের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হয়। ভাবনার মধ্য দিয়ে শিখন হয়। শিশুকে চিন্তা করতে দিতে হবে। A child has to be given the opportunity to think–বোধের জগতে চিন্তনই একমাত্র পথ যা দিয়ে শিখন সম্ভব। শিশুর ভাবনাকে আলোড়িত করতে পারে এমন পরিবেশ ও বিষয় উপস্থাপনা করা দরকার। এর মধ্যেই চ্যালেঞ্জ লুকিয়ে থাকে।

শিশু-নিরীক্ষণ—শিশুকে চেনা (Knowning the child)

পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতশ্রেণীর প্রাণী হল মানুষ। মনুষ্যেতর প্রাণীদের আচরণ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে তারা যে সব আচরণ সম্পাদন করে তার অনেকগুলিই শিক্ষাজাত আচরণ নয়। মৌমাছি নিখুঁতভাবে মৌচাক তৈরি করে, বাবুই পাখি সুন্দরভাবে বাসা বাঁধে। কোনো রকমের প্রশিক্ষণ ছাড়াই তারা এসব কাজ সম্পন্ন করে। মানব শিশুর মধ্যেও সহজাত কর্মপ্রবণতার তাগিদে শেখা আচরণধারার সন্ধান পাওয়া যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে পরবর্তীকালে এই সহজাত ক্ষমতা কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে যায়।

শিশুর মধ্যে রয়েছে কোনো বিষয়কে প্রত্যক্ষ করার, বিশ্লেষণ করার, যুক্তি-বিচার প্রয়োগের ও পৃথগীকরণ এবং সাধারণীকরণের বিস্ময়কর ক্ষমতা। পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে বাস করতে করতে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির পরিপুষ্টি ঘটতে থাকে। শিশু তার মনের কর্মশালায় একদিকে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় অপরদিকে তেমন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সব কিছুকে মিলিয়ে নেয়।

শিশু যখন কিছু শেখে তখন যে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করে, নিজের মধ্যেই সে বিচার-বিশ্লেষণ করে, সিদ্ধান্তে আসার জন্য তার যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করে। বিষয়ের কার্যকারণকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য সে নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলীর (innate potential) প্রয়োগ করে। প্রকৃতপক্ষে, কোনো বিষয়কে জানার যে দীর্ঘ, জটিল প্রক্রিয়া আছে তার সবটাই শিশু ব্যবহার করে। ছোট্ট শিশুর এতবড় বিশ্লেষণী ক্ষমতা আমাদের মধ্যে বিস্ময় জাগায়। যে কোনো পরিস্থিতির সে সরাসরি মুখোমুখি হতে চায় এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নতুন আচরণ আয়ত্ত করে। এর জন্যই একথা বলা যায় যে, শিশুর এই আচরণ, নির্দেশনা বা প্রশিক্ষণ নিরপেক্ষ এবং সহজাত।

শিশুকে জানা

প্রতিটি শিশুর আচার-আচরণকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, কতকগুলি আচরণ তার জন্মগত আর

কতগুলি আচরণ সে আয়ত্ত করে পরিবেশ অনুযায়ী, ফলে তার আচরণের প্রকাশভঙ্গিও ভিন্নতর হয়। কতকগুলি অনুকরণপ্রসূত, কতকগুলি স্বতঃস্ফূর্ত, কতকগুলি আরোপিত, কিছু পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

একটি শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন আমরা ধরে নিই যে শিশুটি কিছু শিখে আসেনি। ফলে আমরা শূন্য থেকে শুরু করি। বাস্তব অবস্থাটি কি তাই? অথচ বাড়িতে সে যখন ১, ১$\frac{১}{২}$, ২ বছর বয়সে আশ্চর্য কাজকর্ম করে তখন আমরা বলি বাচ্চাটার কী বুদ্ধি। বড় হলে আরো কতো বুদ্ধি হবে। আসলে তার শিখন তো ঐ সময় থেকেই পরিপক্বতা লাভ করতে শুরু করেছে। নিজের চেষ্টায় তার বিচার-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে এই সময়ে সে কথা বলতে শেখা থেকে শুরু করে নানান ধরনের জটিলতার কাজ আয়ত্ত করে ফেলে। এই স্বাভাবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে থাকে এক পরিকল্পিত চিন্তা এবং এটি গঠিত হতে শুরু করে তার ৬ মাস বয়স থেকেই। এই পরিকল্পিত চিন্তার পিছনে আছে তার মস্তিষ্কের পরিণতির কাজ। বুদ্ধির অধিকতর স্ফুরণের জন্য শিশুকে Challenging situation (কঠিন সমস্যামূলক পরিস্থিতি)-এর সম্মুখীন করা দরকার।

ছাত্রদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে পাঠের সঙ্গে সম্মিলিত করতে হবে — তবেই শিখন সার্থক ও দৃঢ়বদ্ধ হবে।

শিশুর পূর্বার্জিত সামর্থ্য

বিদ্যালয় শিক্ষার প্রারম্ভে অনেক সময় আমরা শিশুর স্বোপার্জিত সামর্থ্যগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিই না বা ভেবে নিই শিশু কিছুই শিখে আসে না। কিন্তু আমরা যদি শিশুর আচার-আচরণ, কথাবার্তা-কাজকর্ম, উত্তর-প্রত্যুত্তর সব কিছুকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করি তাহলে বিপুল বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করব যে, কথাবার্তায় সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার, কালবিন্যাস, আংকিক জগতের অনেক হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলীরই পরিচায়ক।

এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলীকে শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব ও মর্যাদা না দিলে সার্থক শিখন সম্ভব হয় না।

শিশুর নিজস্ব জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম জীবনরক্ষাকারী শক্তি বা সামর্থ্যসমূহ সে নিজে নিজেই আয়ত্ত করে ফেলে তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

* দিন-রাত্রি— আলো-অন্ধকার — সূর্য-চন্দ্র—বেলা বাড়লে গরম বাড়ে ...
* মেঘ-বৃষ্টি — মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, মেঘ না থাকলে বৃষ্টি হয় না।...
* বাতাস-ঝড় — ঝড়ে কোনো জিনিস উড়ে যায়।
* কিছু জিনিস জলে ভাসে — কিছু জিনিস জলে ডুবে যায়।
* ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি — স্বাদ, গন্ধ, শীত, গরম, চোখ বন্ধ-খোলা...
* সব জিনিস জ্যান্ত নয়...
* উঁচু-নীচু—হাল্কা-ভারী।
* ছোট-বড়।
* খাদ্য-অখাদ্য।

উপরোক্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা শিশুরা যান্ত্রিকভাবে করে। এই বিষয়গুলির কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে খুব বেশি অবহিত থাকে না।

এই কার্যকারণ সম্পর্ক জানার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা তৈরি করা, কী, কেন, কীভাবে এসব জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলার কাজ হচ্ছে বিদ্যালয়ের এই জিজ্ঞাসাই তাকে পথ খুঁজতে সাহায্য করবে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন মানবজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠন অনেক সহজতর হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীর "প্রকৃতিবিজ্ঞান" তৃতীয় ভাগের শেষ অনুচ্ছেদে "মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব" অংশটি পুনরুল্লেখ্য।

শিখনের নানা পথ, নানা ভঙ্গি

অনেক সময়েই আমরা খেয়াল করি না যে শিশুদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিবৈষম্য রয়েছে। তাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যর পরিসীমার মধ্যেও গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে। প্রতিটি শিশুই একে অপরের থেকে কিছুটা পৃথক। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে প্রতিটি শিশুকেই আমরা অনন্য প্রকৃতির বলতে পারি।

শিশুদের সকলের শেখার গতিধারা একই রকমের নয়। কোনো একটি বিষয় শেখার সময় শিশুদের সকলে একই পথ ধরে এগোয় না। (প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ আলোচিত হবে।)

একবার চতুর্থশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একটা মজার খেলা দেওয়া হয়েছিল। শিবানী দিদিমনির ব্যাগে চারটি ভাগ ছিল। চেন দিয়ে ঘরগুলি বন্ধ করা ছিল। প্রত্যেকটার মধ্যে কিছু ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছিল। ছাত্রছাত্রীদের গোল করে বসিয়ে মাঝখানে ব্যাগটা রাখা হল। ছেলেমেয়েদের বলা হল এক-একজন করে গিয়ে ব্যাগে কী আছে তা আবিষ্কার করবে এবং নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে তাদের কাজের ফল লিখে ফেলবে।

খেলা শুরু হওয়ার প্রথম থেকে দেখা গেল কোনো ছাত্র বা ছাত্রী একরকমভাবে কাজটা করল না। প্রত্যেকের আসন ছেড়ে আসা থেকে কাজ সেরে আবার আসনে ফিরে যাওয়া অবধি কাজ ভিন্ন রকমের। অথচ ফল প্রায় একই। কাজ করবার প্রকৃতিও ভিন্ন। আসন ছেড়ে আসা থেকে ব্যাগের কাছ এলে সেটাকে প্রথম ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা, ব্যাগটিকে সন্তর্পণে কোলে তুলে নেওয়া বা সামনে রাখা, কোন্ চেন আগে খুলবে কোন্টা পরে খুলবে— মনে রাখা, একই চেন দুবার খোলা ইত্যাদি নানা মজার ব্যাপার ঘটতে লাগল। কেউবা ব্যাগটাকে ভাল করে দেখে সন্তর্পণে ব্যাগটা কোলে তুলে নিল। তারপর হাত দিয়ে একটু চেপে দেখে নিল ভিতরে কী থাকতে পারে, কোথায় কোন্টা থাকতে পারে। পরে চেন খুলতে শুরু করল। কেউবা এসে ব্যাগটার চারপাশে ঘুরে ভাল করে দেখে নিল। এভাবে এক-একজন এক-একভাবে এল এবং দেখল। যাওয়াও তেমনি ভিন্ন রকমের। বেশিরভাগ সময় আমরা শিশুর নিজস্ব পন্থা এবং উদ্ভাবনী প্রক্রিয়াকে আমল দিই না। তার বড় কারণ আমরা একটা সেটে শিখতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং আমরা চাই সেই সেটে (Set) শিশু শিখুক। একটি অপরিহার্য পথ আমরা বলে দিই এবং চাই শিশু একমাত্র সেই পথেই অগ্রসর হোক।

যোগ কতরকম ভাবে করা যায়? আমরা বলব একটি এবং আরো উন্নত হলে দুটি বা বড়জোর তিনটি। কিন্তু যোগ যদি হৃদয়ঙ্গম হয় তবে একই শিশু বহুভাবে যোগ করতে পারে এবং বহু শিশুর পন্থা শত রকমের হতে পারে। নিজেরা চেষ্টা করলে যোগে বিশ/পঁচিশটা পথ তৈরি করতে পারে।

নিজের উদ্ভাবন করা কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের কাজ করতে দেওয়া উচিত। যদি দেখা যায় কোনো শিশু ধরাবাঁধা নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করছে, তাহলে তাকে নিরুৎসাহ করা যাবে না। শিশুর স্বাভাবিক প্রচেষ্টায় বাধা দিলে তার চিন্তা করার শক্তি, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বার করা ও সমগ্র বিষয়টি উপলব্ধি করার ক্ষমতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে।

শিশুরা শিখন বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক সময় নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী পন্থা উদ্ভাবন করে। সেই পদ্ধতিগুলি বয়স্ক মানুষের বিচারে সঠিক বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু শিশু তার নিজের উদ্ভাবিত উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে সেজন্য সেই বিশেষ উপায়টি তার কাছে সঠিক। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু তার কর্মপদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনে। এজন্য সবসময়েই শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার যে শিশুরা সকলে একভাবে চলে না। নিজস্ব সৃজনশীলতা, উপলব্ধি, আগ্রহের ক্ষেত্র, মানসিক সামর্থ্য ও তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রভাবে শিশু বিভিন্ন গতিধারায় ও বিভিন্ন পন্থায় শেখার কাজটা সম্পন্ন করে।

শিক্ষার্থীকে কেন শিক্ষিকা/শিক্ষকের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। মনে রাখতে হবে যে মূল্যায়নের সাথে সময়সীমার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সেজন্য শিক্ষিকা/শিক্ষক নির্দেশিত পদ্ধতিই শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে হয়।

শেখার কাজটা কি সরলরৈখিক এবং ক্রমসমষ্টিমূলক?

শেখার কাজটি সরলরেখার মতো সহজ ও একমুখী কাজ নয়। শেখার কাজ, যোগের অঙ্কে একটি সংখ্যার সঙ্গে অপর একটি সংখ্যার সংযোগে যোগফলরূপ সরল উত্তরে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াও নয়।

শিশু যখন ধ্বনি উচ্চারণ করতে বা কথা বলতে শেখে তখন তাকে অনেক জটিল প্রক্রিয়ায় তা আয়ত্ত করতে হয়। নিজের ঠোঁট, জিভ, আলজিভ, গাল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসবায়ু প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে শিশুকে ধ্বনি উচ্চারণে সচেষ্ট হতে হয়। সংশ্লিষ্ট দেহযন্ত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা শিশুর সহজাত । শিশু ক্রমাগত প্রচেষ্টায় এগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। নিজের উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে পরিবার-পরিজনের উচ্চারণধারার মিল খুঁজতে চেষ্টা করে। স্বকীয় প্রচেষ্টায় শিশু নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করে ও আচরণধারার সংশোধন করে। শিশুকে যদি ধ্বনি উচ্চারণ করার প্রক্রিয়া আদ্যন্ত শেখানো হত তাহলে সেই কাজটা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। শিশু যা শেখে তার সঙ্গে তার পূর্বে শেখা বিষয়বস্তুর সংযোগ ঘটে। সেই সংযোগের ফলে অনেক সময়ে শিখনের পরিমাণ পূর্বে ও পরে শেখা বিষয়বস্তুর তুলনায় অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়। একথা বলা যায় যে, শিশুর শিখন প্রক্রিয়া সমান্তরাল ধারায় চলে না। শিখন প্রক্রিয়া একের পর এক জ্ঞানের সংযোগও নয়।

শিশুর বিছানায় ওঠা এবং বিছানা থেকে নামা। কী কী কাজ করতে হচ্ছে। দেহের ভারসাম্য রাখা, পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কাজ করা, অভিকর্ষ—কেন্দ্রকে এমন স্থানে রাখা, যা শরীরের কোন অংশকে ভিন্ন পথে টেনে না নেয়, উচ্চতার পরিমাণ (মানসিক পরিমাপ), দেহের ভারের পরিমাপ, ব্যর্থ হলে কতটা সমস্যা হতে পারে তার হিসাব, এই কাজে অন্যের মনোভাব কেমন হবে তা ভেবে রাখা, উপরে কেন উঠবে তার উদ্দেশ্য ঠিক করা ইত্যাদি, এত কাজ একটা কাজকে কেন্দ্র করে। এর কোনোটাই তো সরলরৈখিক নয়। আর এর মধ্যে একধরনের বা ক্রমপর্যায়ভুক্তও নয়। সব একসঙ্গে বহুমুখী ধারায় ঘটছে।

শিখন এমনই বহুধা বিভক্ত।

কোন্ পরিস্থিতিতে শিখন যথোপযুক্তভাবে সম্পন্ন হয়?

পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্যই শেখার প্রয়োজন। বাইরের জগতের তাগিদ থেকেই শেখার কাজটা শুরু হয়। পরিবেশ যদি অপরিবর্তনধর্মী হত তাহলে নতুন আচরণধারা আয়ত্ত করার তাগিদ থাকত না। শিশুও নতুন কিছু শেখার জন্য উদ্যোগী হত না। যথোপযুক্তভাবে শিখন সম্পন্ন করার জন্যে শিশুর মধ্যে তাগিদের সৃষ্টি করা দরকার, পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। শিখনের সঙ্গে চাহিদাকে সংযুক্ত করতে পারলে শিশু আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শেখে। শেখার কাজটার সঙ্গে দেহ-মনের উপযুক্ত পরিণতির সম্পর্ক রয়েছে। জন্মগত প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশের ফলে আচরণের গুণগত বা পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বা জন্মগত সম্ভাবনাগুলোর বাস্তবায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াই হল পরিণমন। পরিণমন যথোপযুক্ত শিখনের সহায়তা করে। সব শিশু একই গতিতে ও একই পদ্ধতি অবলম্বনে শেখে না। শিশুর শিখন তখনই যথোপযুক্ত হবে যখন সে স্বাধীনভাবে ও যথেষ্ট সময় নিয়ে শেখার সুযোগ পাবে। শেখার সময় শিশু শেখার নতুন বিষয়বস্তু তার পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নিয়ে শেখে। এজন্য শিশুর সামনে নতুন পাঠের উপস্থাপনা করা দরকার যাতে সে তার পূর্বজ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর কাছে বিষয়বস্তু অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে ও শেখার কাজটি উপযুক্ত মাত্রায় সম্পন্ন হবে। শেখার কাজে শিশুকে যত ভাবনার অবকাশ দেওয়া হবে তার শিখন ততই গভীর হবে। শেখার বিষয় জীবনকেন্দ্রিক হলে শিশুদের কছে সেই বিষয় খুবই আকর্ষণীয় হয় কারণ এর থেকেই সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

খেলাধুলা করা, শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা। তার মধ্যে যে অফুরন্ত কর্মশক্তি আছে তাকে নিয়ত ব্যবহার করে সে কিছু করতে চায়। তার এই সদা চঞ্চলতা খেলায় রূপান্তরিত হয়। এর মাধ্যমে সে অনেক কিছু শেখে। প্রকৃত শিখন অনেকাংশের খেলার অনুরূপ। এর মধ্যেই সে খুঁজে পায় তার অফুরন্ত কর্মশক্তির সার্থক প্রকাশ ও প্রয়োগ।

অর্থ না বুঝে যান্ত্রিকভাবে বিষয়বস্তু সার্থকভাবে আয়ত্ত করা যায় না। চাপে পড়ে মুখস্থ-জিনিসটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কখনো তা মনের জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে পারে না। যে কোনো বিষয় যদি স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানের অঞ্চলে প্রবেশ করে তবে তা শেখা হবেই।

কী করবো, কেন করবো? এর সদুত্তর না পেলে শিখন সম্ভব হয় না। মনে রাখা আর অধীত হওয়া এক কথা নয়। কার্যকারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যা শেখা যায় তা চিরস্থায়ী। কারণ সেটা প্রকৃত শিখন। তিনটি মৌলিক প্রশ্ন 'কী', কেন, কীভাবে শিখনকে প্রভাবিত করে। শিশুর সামনেও প্রতিনিয়ত এই প্রশ্ন তিনটি উপস্থিত হয়। যে কোনো শিশু নতুন কিছু দেখলে বা নতুন কিছুর সামনাসামনি হলে তার মনে এই তিনটি প্রশ্ন জাগরিত হয় এবং সঙ্গীকে সে বারবার এই তিনটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে বলে। প্রতি মুহূর্তেই সে প্রতি কথাকে বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে চায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি এই পরিবেশ তৈরি করা না যায় তবে শিখন সম্ভব নয়। শিক্ষণীয় বিষয়কে কাজের মাধ্যমে শিখতে দিলে তবেই তার শিখন সম্ভব।

শিশুকে যত ভাবানো যাবে তার শিখনমাত্রা ততই বৃদ্ধি পাবে। ভাবনার মধ্য দিয়েই শিশু সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।

শিখনে বাধা—কঠিন অঞ্চল (Struggle in learning hardspots)

শিখনের ক্ষেত্রে কাঠিন্যযুক্ত অংশ (Hardspots) থাকলে শিশুর শেখার অগ্রগতি সব সময়েই একইভাবেই

হয় না। চলতে চলতে হঠাৎ হোঁচট খাওয়া বা গতি মন্থর হয়ে যাওয়ার মতোই ঘটনা ঘটে শিখনের ক্ষেত্রেও। শিশুর শিখনে মাঝে মাঝে কিছু কঠিন অংশ বাধার সৃষ্টি করে। এই অংশগুলিকে আমরা শক্ত অংশ বা অনালোকিত অংশ বলে চিহ্নিত করে থাকি (Hardspot or dark area) । কেন শিশুর কাছে এই অংশগুলি কঠিন বলে মনে হয় তা বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি কারণ জানা যায়।

শিশু নতুন ধারণাকে গ্রহণ করার সময় তার পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান করে। শিশুর জ্ঞানমূলক স্তরে যে তথ্য ও ধারণা (Concept) রয়েছে তার সঙ্গে যদি উপস্থাপিত নতুন তথ্য ও ধারণা কোনও ভাবেই সম্পর্কযুক্ত না হয় তাহলে শিশুমন সেই তথ্যকে গ্রহণ করতে চায় না। সেই বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা অথবা সুস্পষ্ট অর্থ খুঁজে পায় না। সে সবসময় চায় উপস্থাপিত বিষয়কে তার জ্ঞানের জগতের পরীক্ষাগারে ফেলে বিশ্লেষণ করতে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষাগারে ফেলতে সহজ এমন কিছু থাকে তাহলে শেখার আকর্ষণ বাড়ে। এজন্য শেখার কাজ তার কাছে অর্থবহ ও আনন্দদায়ক হয় না। এগুলি বিবেচনা না করে আমরা প্রায়ই শিশুকে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার সুযোগ না দিয়ে না বুঝে মুখস্থ করতে বাধ্য করি। শিশুকে শিখতে সাহায্য করার সময়, অগ্রসর হতে হবে জানা থেকে অজানার দিকে। অর্থাৎ উপপাদ্য বিষয়কে নিয়ে সে যেন একটি জ্ঞানপ্রকল্প রচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে জানার সঙ্গে অজানার সংযোগসূত্র স্থাপন করে অগ্রসর হতে হবে। নইলে তার বিশ্লেষণী মন বিষয়কে গ্রহণ করতে পারবে না।

অনেক সময় শিক্ষকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব থাকে। কারণ অভ্যাসবশত তথ্য আহরণ বা চয়নকেই আমরা শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে মনে করি। কেবল তথ্য পরিবেশনায় কার্যকারণ বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে না। আবার সূত্র বা কারণ বলতে আমরা সরলরৈখিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করার প্রবণতাকে বেশি গুরুত্ব দিই। একটি পদ্ধতি বা একটি সূত্রকেই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ ধরা হয়। ফলে শিশুর শিখন যে বহুমাত্রিক এবং বহুধারায় প্রবাহিত হতে চায় তাকে আঘাত দেওয়া হয়। নিছক অনুকরণ করতে করতে তার কাছে বিষয়বস্তু একঘেয়ে, আকর্ষণহীন এবং অর্থহীন বলে মনে হয়।

প্রকৃত শিখনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেখানে শিক্ষক নির্দেশিত বিষয় প্রক্রিয়া ও কৌশল বা সূত্র প্রয়োগ সীমিত থাকে সেখানে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ ততটা সজীব থাকে না। শিশুকে এই ক্ষেত্রে মনের সমস্তটা নিয়োগ করতে হয় না। যতটুকু মানসিক ক্ষমতাকে সে নিযুক্ত করে তা শিক্ষক নির্দেশিত পথটাকে অনুসরণ করার জন্যই ব্যয়িত হয়। তার ভালমন্দ, কেন, কীজন্য, কীভাবে ইত্যাদি কার্যকারণ বিশ্লেষণে সে নিজেকে নিয়োজিত করে না। এমনি করে চলতে হবে, এমনি করে বলতে হবে, এমনি করে শিখতে হবে এবং এমনি করে সমাধান করতে হবে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুখস্ত করে অন্ধভাবে প্রয়োগ করার মধ্যে সে নিজেকে বেশি সীমিত রাখে। এক্ষেত্রে মনের স্বাভাবিক সৃজন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে হয় না। তাকে সরলরৈখিক বিকল্পহীন পন্থায় এগোতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণিতের ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলা হল কোনো সমস্যাকে এভাবে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরিত করে সমাধান করতে হয়। বলা হয় "করতে হয়" কিন্তু "করা যায়" নয়। এর পরের প্রশ্নে বলা ছিল সমস্যাগুলিকে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করে সমাধান কর। একটি সরলরেখা দেখিয়ে দেওয়া হল। পরের কাজ অনুরূপ সরলরেখা আঁকা। এতে মন কী কাজ করল? বৈচিত্র্যহীন একই জিনিসের অনুকরণ ও অনুসরণ। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা একমুখী সেট করে দেওয়া হল — কবিতা পড়। শক্ত শব্দের মানে জান। কবিতাটি গদ্যে বল। ঘটনা জানা হল। এবার সেটাকে গল্প মনে করে তার বিভিন্ন অংশ থেকে প্রশ্ন ও শেষে কিছু ব্যাকরণ মুখস্থ। ব্যস, কবিতা পাঠ একটি সরলরেখায় ছন্দ রেখে বলা এবং কমা, দাঁড়ি কোথায়

আছে মুখস্থ করা। সব কবিতার একই দশা। মনের কাজ কোথায়? এই অবস্থা শিশুর কাছে প্রতি স্তরই কাঠিন্যে ভরা বলে মনে হবে। কারণ এখানে স্মৃতিচারণাই প্রধান। মননশীলতার সুযোগ থাকলে প্রকৃত শিখনের ক্ষেত্রে শিশু স্বাধীনতা পায় অনেক বেশি। এখানে বিষয়টি প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে তার কাছে হাজির হয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তার মন-প্রাণ বিষয়টাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সে নানা কৃৎ-কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। সহজ থেকে ধীরে ধীরে কঠিন স্তরে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে।

প্রকৃত শিখন পদ্ধতিতে বিষয়বোধ কেমন করে অর্জিত করা যায় সেটা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে শিখনে পদে পদে কঠিন অঞ্চলের মুখোমুখি হতে হয়। আসল চ্যালেঞ্জ এখানেই এবং শিখনের বৈচিত্র্য এখানেই। যত বেশি করে বাধা পাওয়া যাবে তত বেশি করে বাধা প্রতিরোধ করার কৌশল আবিষ্কৃত হবে। আর এভাবে এগোতে এত মজা, এত আনন্দ অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। স্রোতহীন তরঙ্গহীন নদীতে নৌকা চালানোর কোনো রোমান্স নেই। পার্বত্য নদীতে যেখানে প্রবল স্রোত চড়াই-উৎরাই-এর সঙ্গে সংঘাত হবার সম্ভাবনা এমন নদীতে নৌকায় পাড়ি দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর রোমান্স, আনন্দ আর জয়ের উল্লাস আর কোনোখানে পাওয়া যায় না। শিখন পদ্ধতি এমনিভাবেই নানা মাত্রায়, নানা গতিতে, নানা দিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে।

শিখনে কঠিন অঞ্চলগুলিই শিখনের পরীক্ষাস্থল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রায়ই দেখা যায় শিশুরা ঠিক মত বর্ণমালা লিখতে পারছে না। একটু বড় হয়ে ঐ শ্রেণীরই শেষের দিকে যুক্তবর্ণহীন শব্দের বানান ভুল করছে। এই বানান ভুলের একটা বড় অংশ হল যেখানে আ-কার দেবার কথা সেখানে আ-কার না দেওয়া। আবার তাদের লেখা তাদের পড়তে দিলে পড়ার সময় তারা আ-কার যুক্ত করেই পড়ছে। এই যে লেখার সময় বর্ণমালা ঠিকমত লিখতে না পারা এবং সেখান থেকে মাত্রা ঠিকমতো লিখতে না পারা অবশ্যই এই পর্যায়ে ভাষা শিক্ষার কঠিন স্থল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এটা আরো প্রকট হয়। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে পেছিয়ে পড়ার জন্য ভুল লেখা এবং বানান ভুলকে বিশেষভাবে দায়ী করা হয়। ভাষার খাতায় তো ফল খুবই খারাপ হয়, আবার এই দোষে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলেও ফল খারাপ হয়। কারণ ভুল বানান আর ভুল বাক্য পড়তে পড়তে বিরক্তিতে তাকে কম নম্বর দিতে হয়। তখন বিষয়বস্তুর চেয়ে তার প্রকাশভঙ্গিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন শিক্ষার ক্ষেত্রেও এটি অন্যতম অন্তরায় এবং এর জন্য বোধের স্তরও বেশি পরিস্ফুট হতে পারে না। শিশু বারে বারেই বাধা পায়। ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আস্থা কমে আসে। ফলে একসময় সে পেছন বেঞ্চের শিশু বলে চিহ্নিত হয়ে যায়।

সরলতম বানানে এই ভুল বারে বারে সংশোধন করার চেষ্টা করেও ঠিক হয় না। এটা শিখনের একটা কঠিন অঞ্চল। তা চলতে থাকে। ভুলটি ধীরে ধীরে মানসিক দুর্বলতায় পরিণত হয়। কেন এই ভুল প্রতিষ্ঠিত হল? শিখনের ক্ষেত্রে এটি একটি কঠিনতম বাধা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। কিন্তু কেন এবং কীভাবে এই কঠিন অঞ্চল সামনে হাজির হল সেটা দেখার বিষয়।

প্রথমেই ভাষাশিক্ষার শুরুতেই কিছুদিন শোনা বলা অভ্যাস করানোর পরই চলে যাই বর্ণমালা শেখা ও লেখার অভ্যাসে। তখনও শিশু কথন ও লেখন এই দুই-এর মধ্যে মানসিক ভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারেনি। মুখে যা বলছি তার প্রতিফলন যে লেখ্যরূপ প্রতিভাত হচ্ছে এটা উপলব্ধি করার মতো যথেষ্ট সুযোগ দিই না। ফলে কণ্ঠনিঃসৃত শব্দাবলীকে যাকে আমরা ভাষা বলি তাকে যে চিত্ররূপে প্রকাশ করা এমনিভাবে যায় এটা বোঝার মতো অবকাশ দিই না। এ বিষয়ে গান্ধীজির বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন বর্ণমালা

লেখানোর আগে শিশুকে ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শেখানো দরকার। তারপর তাকে পড়তে শেখানো দরকার। সে যখন তার আকর্ষণীয় বিষয়গুলি পড়তে শিখবে তখন তার মন কিছু একটা করতে প্রস্তুত হবে। তখন তাকে নানা আকৃতি আঁকতে দিতে হবে। জ্যামিতিক বিভিন্ন আকৃতি ও পাখি ইত্যাদি তার প্রিয় প্রাণী বা বস্তু আঁকা অভ্যাস করতে করতে ও তার সঙ্গে পড়তে পড়তে সে মানসিকভাবে লেখার জন্য প্রস্তুত হবে। তখনই তাকে লেখার কাজ দিতে হবে এবং বর্ণমালা লিখতে দিতে হবে। কারণ এর আগে পর্যন্ত সে মানসিকভাবে দেখে পড়ে ও বলে লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে। অন্তত ছমাস এধরনের কাজ করানোর পর তবেই তাকে লেখার অভ্যাসে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন যে লেখা একটি চারুকলা। এর জন্য মানসিকভাবে তৈরি না করে চাপিয়ে দিলে শিশুর মানসিক বৃত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে এসব না করে প্রথম থেকেই তাঁকে লিখতে বাধ্য করে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং তাঁর তখনকার মানসিক যন্ত্রণা কেউই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেনি।

এখন বিচার্য, বানান ভুলের ক্ষেত্রে শিশুর কঠিন অঞ্চল কোনটি? দেখা যাক শিশু কেমন করে বানান শিখেছে। বর্ণমালার অ আ ক খ শিখতে শিখতে সে লিখতে আরম্ভ করল ব ক বক, ধ র ধর ইত্যাদি। এক নম্বর বাক্সে ব ক ধ র ইত্যাদি দেখে চোখ যে স্পন্দন মস্তিষ্কে নিয়ে গেল তা ছিল ব ক ধ রা র একটা বাক্সবন্দী সীমিত রূপ যারা একত্রিত হলে বক এবং ধর ধ্বনি, ধ্বনিরূপের প্রতিফলনে সীমাবদ্ধ। এটাকে ভেঙে আবার যখন তাকে ব ই বই এবং ক র কর এই চিত্রপটে আনা হল তখন ব ক র সব পূর্ব দৃশ্যপট থেকে পাল্টে গোলমাল করে দিল। ফলে মস্তিষ্ক কোনটা ধরবে আর কোনটা বাদ দেবে বা তার সামগ্রিক চিত্ররূপ কেমন সেটা ধরতে পারল না। বিপত্তির শুরু এখান থেকেই। আবার দ্বিতীয় বিপত্তি হল যখন বক লেখাতে ছড়া ব্যবহার করছি।

ওই এল ঝড়
উড়ে গেল বক

তখন ওই এল, উড়ে গেল এগুলির দৃশ্যরূপ দিচ্ছি না। অথচ পড়ার সময় বলে চলেছি। শিশু কথা শুনছে লেখাগুলি কি যেন একটা, ভাবছে, মেলানোর চেষ্টা করছে— 'ওটা বুঝি' ওই 'ওটি বুঝি' এল ইত্যাদি।

সুতরাং বানান ভুলে এবং হাতের লেখা খারাপে যে কঠিন অঞ্চল বা Hardspot আছে তার বেশিরভাগটা ঘিরে আছে শিক্ষণ কৌশলের ত্রুটির উপর। তাদের মস্তিষ্কে ঠিকমতো ছবি তৈরি করতে পারছি না। সুতরাং ভুল করাটা শিশুর দোষ নয়। তার শেখার ক্ষেত্রে তার কাছে কঠিন অঞ্চল হল শিখন পদ্ধতির — শিখনের নয়।

যেখানে প্রকৃত শিখন চলে সেখানে যে সব কঠিন অঞ্চল তৈরি হয় সেগুলি প্রকৃত শিখনের কঠিন অঞ্চল। এটা ধরতে গেলে কোন জায়গায় এই অঞ্চলটি আছে তাকে চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ শিখনের কোন পর্যায়ে শিশু কঠিন অংশ পেয়েছে তা জানতে হবে। সমস্যা হল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুও ঠিক মতো জানতে পারে না তার কাছে দুর্বোধ্য অংশ কোনটি। তাই তার শিখন স্তরকে বিশ্লেষণ করে তার কঠিন অঞ্চলকে জেনে নিতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও জানতে হবে যে কেন এই অংশটি তার কাছে দুর্বোধ্য হল। হতে পারে উপস্থাপনের ত্রুটি। সে যে ভাবে কোন নতুন জিনিসকে মানসিক ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত, উপস্থাপনা সেই ভাবকে করতে পারেনি। হতে পারে তার জানা জগতের সঙ্গে ভীষণভাবে গরমিল ঘটেছে — একটুও সূত্র খুঁজে পায়নি। হতে পরে যেমন করে সমাধান করতে বা ভাবতে বলা হয়েছে সেটা সে পছন্দ করেনি বা সেই ধরনের প্রতি তার

আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। আবার এও হতে পারে যে, করণীয় কাজটি এতই যান্ত্রিক যে কেন করবে এবং কি জন্য করবে সে বুঝে উঠতে পারেনি। নানা কারণ থাকতে পারে। যে কারণটি পাওয়া যাবে তা দূর করার কৌশল ঠিক করতে হবে।

কঠিন অংশ নির্ধারণ করতে ধাপে ধাপে এগুতে হবে।

১) কী কী শিখেছে তা চিহ্নিতকরণ—

২) এগুলি শিখতে কোন কোন জ্ঞান কাজে লাগে তা নিরূপণ।

৩) ঐ জ্ঞানগুলি অর্জনের জন্য কী কৌশল সে গ্রহণ করেছিল তা জানা।

৪) বর্তমান অংশে কোন কোন ক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে নবতর কৌশলে সংঘাত বা বিরোধ হচ্ছে তা জানতে হবে।

এর পর দূরীকরণের কৌশল ঠিক করতে হবে উপরের জ্ঞানগুলিকে কাজে লাগিয়ে।

ভুলের প্রসঙ্গে

একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "ভুল মানুষের স্বভাব-ধর্ম"। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রায়ই নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়ে থাকেন। মা, বাবা, শিক্ষক ও সমাজের বয়স্ক মানুষেরা ছোটদের ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে কিন্তু সহানুভূতিশীল নয়। শিশু তার বিকাশ বা পরিণমনের নিজস্ব ধারা অনুযায়ী শিখতে চেষ্টা করে। শিশুর প্রচেষ্টা ও তার পবিণাম যখন আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে ঠিক ঠিক মেলে না তখনই আমরা ধরে নিই যে সে ভুল করছে। শিশু কোন কিছু শেখার পর শিক্ষক তার শিখনের মূল্যায়নের সচেষ্টা হন না বরং তার ভুলগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেই ব্যস্ত হন।

শিক্ষায় ভুলের গুরুত্ব ও ভূমিকা

শিশুর মধ্যে যখন শিখন প্রক্রিয়া চলে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে কিছু ভুল করে। এই ভুল হলেই আমরা তাকে ভুলের উৎস সন্ধানে উৎসাহ না দিয়ে নিরুৎসাহ করে তুলি — এবং "তোমার দ্বারা কিছু হবে না" ঘাস কাটগে যা", "নিরেট, বোকা" ইত্যাদি বিশ্লেষণে তাকে হীনমনস্ক করে তুলি। শিশু তখন এই হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমে পিছিয়ে পড়তে পড়তে শেষে বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আমরা অনেকেই ভুলে যাই যে ভুলই হচ্ছে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। ভুলকে চিহ্নিত করার ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে শিখনের সামর্থ্য। শিশু যখন নিজের ভুলের অংশগুলি নিজেই আবিষ্কার করে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সে তার ভুলকে নিজে নিজে সংশোধন করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসে — তখনই তার শিখন সম্পূর্ণ হয়, এবং এর মাধ্যমে সে জয়ের আনন্দ উপভোগ করে।

সংশোধন করতে পারবে— তখন তাকে অনুশীলন করিয়ে তার মনে আনন্দ সৃষ্টি করা এবং বিষয় সম্পর্কে তার ধারণাকে আরও দৃঢ়তর করা।

ভুলকে শিখনের নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে বিচার করে আমরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিকে কাজে লাগাতে পারি—

• পারস্পরিক ভাব বিনিময় • স্ব-মূল্যায়ন • বোর্ডে কাজ করা • '?' চিহ্নের মাধ্যমে ভুল অংশকে চিহ্নিত করা।

• কেন ভুল হল তা নিরূপণ করা • মৌলিকভাবে সমাধানে উৎসাহিত করা।

প্রকৃত শিখন বলতে কী বুঝি—

• শিখনের জ্ঞানমূলক, প্রয়োগমূলক ও বোধমূলক দিকগুলি সার্থকভাবে সমন্বিত হলে প্রকৃত শিখন সম্ভব হয়।

• প্রকৃত শিখন সে নিজে নিজে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে যখন আয়ত্ত করে তখন এই নিশ্চিত শিখন তাকে আরও বেশী সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করে। গভীর চিন্তা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

• শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে যা সে পর্যবেক্ষণ করে তা তার মধ্যে এক নিরন্তর প্রক্রিয়ায় কাজ করে। শিশু নিজে নিজেই তার বিশ্লেষণ করে এবং সমস্যাকে সমাধানের চেষ্টা করে—এরই মধ্য দিয়ে তার শিখন হয়।

• চিন্তা, স্মৃতি, রোমন্থন, প্রতিরূপ গঠন, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ, অভিজ্ঞতা, সাঙ্গীকরণ ইত্যাদি শিখনের সোপান।

• পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে বেঁচে থাকার প্রকৌশল আয়ত্ত করা শিখন।

• শিশু, পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন, পরীক্ষা এবং তার থেকে প্রাপ্ত ফলের বাস্তব প্রয়োগ করে আবার সমস্যা উপস্থিত হলে পুনরায় চিন্তা করে, স্বাধীনভাবে সমস্যা উপস্থিত হলে পুনরায় চিন্তা করে, স্বাধীনভাবে সমস্যা মোকাবিলা করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে আসে। অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্ব-সিদ্ধান্তে না পৌঁছনো পর্যন্ত শিখন দৃঢ়বদ্ধ হয় না। এরই মধ্যে ভুল তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পথ দেখায়।

• জীবনবোধের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সাঙ্গীকরণের মাধ্যমে আত্মীকরণ না হওয়া পর্যন্ত তার এই শিখন-প্রচেষ্টা চলতে থাকে। যা দেখে বা শোনে তার সাথে নিজের ভাবনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করাকেই শিখন বলে।

তাহলে আমরা শিখনের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি সাধারণত দেখতে পাই ঃ—

• অভিজ্ঞতা
• পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
• বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ—(যুক্তি শৃংখলার মাধ্যমে)
• সমস্যা—সমাধান—(সিদ্ধান্তে পৌঁছানো,—আনন্দলাভ)
• জ্ঞান—বোধ—প্রয়োগ—দক্ষতা

শিশুর ভুলের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মূলত দুই বা তিনটি দিক থেকে ভুল হয়।

প্রথমতঃ শিক্ষকের কারণে

১) শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্য শিশু ভুল করতে পারে।

২) শিক্ষকের ভুল বক্তব্যে শিশুরা প্রভাবিত হয়।

৩) শিক্ষকের অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট বক্তব্যের প্রভাব।

৪) শিক্ষকের বর্ণনায় যুক্তিমূলক ধাপগুলির ক্রমবিন্যাসের অভাবে শিশু ভুল করতে পারে।

৫) পরীক্ষা করে দেখানোর সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ না করা।

৬) পাঠের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপস্থাপিত না করা।

৭) ব্ল্যাক-বোর্ড ব্যবহারে ত্রুটি— অসম্পূর্ণ বাক্য—অস্পষ্ট হাতের লেখা, ভুল বানান, পরপর সাজিয়ে না লেখা, বোর্ড ঠিকমতো না মোছা।

৮) শিক্ষার্থীরা সকলে ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সে সম্বন্ধে সচেতন না করা।

৯) দুরূহ ভাষার ব্যবহার।

১০) চিত্র ঠিকমতো না আঁকা / বিভিন্ন অংশ ঠিকমতো নির্দেশ না করা।

১১) সমোচ্চারিত শব্দজনিত ভুল।

১২) পড়ানোর সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে অবহেলা করা।

১৩) মূল শব্দ (Key-words)-কে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া।

১৪) সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করা।

১৫) ভাষা শিক্ষার সময় সরব ও নীরব পাঠকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দেওয়া।

১৬) অযথা তিরস্কার বা অবহেলা করা।

পরিবেশজনিত কারণ

১) শিক্ষার্থীর মনযোগের অভাব।

২) স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি।

৩) অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব।

৪) মান অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর অতিরিক্ত চাপ।

৫) সঠিক ধারণা সম্পর্কে অসম্পূর্ণতা।

৬) পৃথকীকরণ ও একত্রীকরণের ধারণা সম্পর্কে ধোঁয়াশা।

৭) পাঠ্যপুস্তকের ভাষার সঙ্গে শিশুর পরিবেশলব্ধ ভাষার পার্থক্য।

৮) পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ ভাষা। অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহারজনিত কারণ।

৯) পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতির অভাব।

১০) হীনম্মন্যতাজনিত কারণ।

১১) অনুপস্থিতির কারণ (বিদ্যালয়ে)

১২) শ্রেণীর পঠন-পাঠনের পরিবেশ শিশুর কাছে অনুকূল বা আনন্দদায়ক না হওয়া।

১৩) কার্যকারণ সম্পর্ক ঠিকমতো না বোঝা।

১৪) বিজ্ঞান বা গণিতে এককের ব্যবহার ঠিকমতো না বোঝা।

১৫) ব্ল্যাকবোর্ড ঠিকমতো দেখতে না পাওয়া।

১৬) লেখার অক্ষমতার জন্য ঠিকমতো মনের ভাব প্রকাশ না করা।

১৭) শ্রেণীকক্ষে শৃংখলার অভাব।

১৮) শিশুর ভাষাগত দক্ষতার অভাব।

১৯) হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতার অভাব।

২০) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অভাব।

২১) সাবলীল পঠন দুর্বলতা

২২) মুদ্রণ প্রমাদজনিত কারণে ভুল শেখার সম্ভাবনা।

শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা-বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু কথা

বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধীয় ধারণা মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যাবলী থেকে অনেকটা পাওয়া যায়। স্নায়ুবিজ্ঞান বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে এক দিগন্তকারী আলোড়ন তুলেছে। বুদ্ধিমত্তার মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারে নিহিত। এই কাজের জন্য প্রায় ২ বিলিয়ন বা ২০ কোটি নিউরোণ আছে গ্রে-ম্যাটারের মধ্যে। স্বাভাবিক মানুষের ৩-৪ শতাংশ নিউরোণ সবসময় কাজ করে। যত বেশী সংখ্যক নিউরোণ করবে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশও তত বৃদ্ধি পাবে। নিউরোনগুলিকে অলসভাবে বসিয়ে রাখলে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশে ঘাটতি দেখা দেয়। উপযুক্ত পরিবেশ ও চ্যালেঞ্জে পড়লে নিউরোণগুলি অত্যন্ত কর্মঠ হয়ে ওঠে এবং কাজ করতে শুরু করে।

সুতরাং নিউরোনকে যত বেশী কাজে লাগানো যাবে বুদ্ধির প্রকাশ ততই ঘটতে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধির প্রকাশ চিন্তনের মাধ্যমে হয়। পর্যবেক্ষণ—পরীক্ষা-নিরিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যখন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সমাধান করা হয় তখন মস্তিষ্কের কোষগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকে।

যারা শারীরিক বা অন্যান্য কারণে কোন মতেই ৩-৪% নিউরোনকে কাজে লাগাতে পারছে না তাদেরই অস্বাভাবিক এবং কমবুদ্ধির মানুষ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ নিউরোনের সার্বিক ক্রিয়াকলাপ এবং তার প্রকাশই হল বুদ্ধির আসল পরিচয়।

মস্তিষ্ক মূর্ত বিষয়বস্তু হলেও মন কিন্তু বিমূর্ত। মনের ভিত্তিভূমি হল মস্তিষ্ক। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ২ 'বিলিয়ন' স্নায়ুকোষ (Neurone) থাকে। জন্মের সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে এর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ স্নায়ুকোষ থাকে। শিশুর ক্রমপরিণতির সঙ্গে এই কোষের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির কালে কোষগুলির সংখ্যা প্রায় দুই বিলিয়নে পরিণত হয়। মানসিক কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে এই স্নায়ু কোষগুলিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গবেষণালব্ধ ফল বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে সাধারণ অবস্থায় এই নিউরোনগুলির ৩% হতে ৪% সক্রিয়ভাবে কর্মসম্পাদনে সহায়তা করে। কাজের জটিলতার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে ১৫% পর্যন্ত নিউরোণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনার কথা। যে কোনও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে আরও বেশী সংখ্যক নিউরোণ কার্যকর হলে তার বুদ্ধিমত্তার মাত্রা বাড়তে দেখা যাবে।

বর্তমানে বুদ্ধির বিকাশ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োগ ক্ষমতার উপরে আবেগের প্রভাবের বিষয়টি

বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হচ্ছে। জীবনের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের উপরে প্রক্ষোভ বা আবেগের প্রভাব যথেষ্ট। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে যে কাজ করি, তার সবগুলিই কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত আচরণ নয়। সারাদিনে আমরা যে যে আচরণ সম্পন্ন করি তার অধিকাংশই হল আবেগপ্রসূত আচরণ বা আবেগতাড়িত আচরণ। শৈশবে আবেগের ক্ষেত্র সীমিত থাকে। শিশুর মধ্যে ঘটনা বিশেষে আবেগ প্রকাশের পরিমিতি বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। শিশু অল্পেই ভয় পায়, সামান্য কারণে বিমর্ষ হয়ে পড়ে অথবা অকিঞ্চিৎকর কারণে অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রক্ষোভ বা আবেগের বিকাশ ঘটতে থাকে। আবেগের পরিমিত প্রকাশ জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে সাহায্য করে। বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ অনেকাংশে আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য বর্তমানে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার সাথে সাথে তার আবেগশীলতারও বিচার করা হয়। জীবনে আবেগের ভারসাম্যই বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রকাশ ও প্রয়োগকে সম্ভবপর করে তোলে। বয়স উপযোগী প্রাক্ষোভিক বিকাশ যার হয়েছে তার প্রক্ষোভাঙ্ক বা Emotional Quotient (E.Q.) 100 বলে মনে করা হয়।

ভাষা শিখন

শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে শুধু তাই নয়, চিন্তন, ধারণা ইত্যাদির বিকাশেও সহায়তা করে। ভাষার বিকাশ প্রথমে শুরু হয় নাম দিয়ে। পরে ধীরে ধীরে শিশু অন্যান্য শব্দ শেখে। প্রথম দিকে শিশুর ব্যবহৃত ভাষার শব্দের মধ্যে বেশী বিশেষ্যের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণতঃ দু বছর বয়সের শিশু মোটামুটিভাবে মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য যেটুকু ভাষা জানা দরকার তা শিখে নেয়। ভাষার বিকাশ অনেকটা সামাজিক ও পারিবারিক বৃত্তিমূলক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। অন্যের ভাষার মধ্যেকার ভাবকে বোঝার ক্ষমতা নানা জনের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের উপর নির্ভর করে। শুধু প্রকাশ ভঙ্গীর বিকাশ নয়, শব্দ ভাণ্ডারের বিস্তৃতিও ভাষার বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এ সম্বন্ধে বলা যায়, পর্ষদ-প্রণীত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে শিক্ষার্থীদের বয়স এবং বুদ্ধির স্তর বিবেচনা করে কাম্য এবং নিয়ত ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শব্দসম্ভার সংযোজিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের সময়ে প্রশিক্ষকগণ/শিক্ষিক-শিক্ষিক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের বাড়ির ভাষা (Home language) পারিপার্শ্বিকতায় উপস্থিত ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্জিত এবং অর্জনীয় শব্দসম্ভারের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন এবং শিক্ষিকা-শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষের পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ভাষা বিকাশের আর একটি দিক হল বাক্য প্রকাশের ক্ষমতার বিকাশ। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রায় ৩ বছরের মধ্যে আয়ত্ত হয়। এই বয়সের শিশুরা মোটামুটিভাবে সব রকম বাক্যই বলতে পারে। সার্থকভাবে শব্দ উচ্চারণ ক্ষমতার বিকাশও এই বয়সের মধ্যে হয়। এই দুধরনের ক্ষমতাই শিশুর পড়ার সামর্থ্য বিকাশে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। শিশুর ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি মনে রাখা দরকারঃ

১। ভাষার বিকাশ শিশুর সামাজিক ও পারিবারিক বৃত্তিমূলক পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল

২। ভাষার বিকাশ তিন থেকে আট বছরের মধ্যে খুব বেশী হয়।

৩। ভাষার বিকাশের দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের থেকে এগিয়ে থাকে।

৪। ভাষার বিকাশের জন্য উপযুক্ত উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়।

৫। কথা বলার ক্ষমতার মাধ্যমেই অধিক ভাষা শিক্ষা হয়।

জন্মের পর থেকেই শিশু মুখ দিয়ে নানান ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ করে। ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে শিশু তার ঠোঁট, জিভ, তালু, চোয়াল, শ্বাস বায়ু, দাঁত ও স্বরযন্ত্রের সাহায্য নেয়। স্বরযন্ত্রকে সক্রিয় করতে শিশু নানা ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ করে। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি এক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ধ্বনি উচ্চারণে সহায়তা করে। এগুলি সবই হল অর্থশূন্য শব্দ। শিশুরা অন্য সকলের কথাবার্তা শোনে। কানে শোনা শব্দগুলি স্বকীয় প্রচেষ্টায় নিজে নিজে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে। ক্রমশঃ যে শব্দগুলি আয়ত্ত করে সে সেগুলির সাহায্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। নিজের উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে বাহ্য বস্তুর সংযোগ সাধন করতে শেখে। শিশু ক্রমশ পরিবারের মানুষজনের উচ্চারিত ভাষা বুঝতে ও আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে। শিশু যখন স্কুলে ভর্তি হয় তখন সে ভাষার ভাণ্ডার নিয়েই সেখানে আসে। বড়দের ভাষার সঙ্গে শিশুর ভাষার অনেক গরমিল থাকতে পারে। তবে ৩ বছর বয়সের শিশুরা শুদ্ধ ব্যাকরণ-জ্ঞান আয়ত্ত করে। তাদের এই সময়ের ভাষার মধ্যে আশ্চর্যরকমভাবে ব্যাকরণের শুদ্ধতা লক্ষ্য করার মত। যার ফলে বাক্যবিন্যাস এমনকি জটিল বাক্য ব্যবহার কোনটাতেই তাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির বাধা নেই। অনেকসময় মনে হয় বড়দের শুনে অনুকরণ করে শিশুরা ভাষা শেখে এবং ব্যবহার করে। আসল ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শিশুরা নিজের মত করে ভাষা তৈরী করে। এটা ভালভাবে বোঝা যায় যখন শিশুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। বড়দের সঙ্গে কথা বলা আর নিজেদের মধ্যে কথা বলার অনেক পার্থক্য আছে। নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে তাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। বড়রা শেখালে ভয়ে বা অন্য মানসিক কারণে তারা সেকথা বলে। কিন্তু ভবিষ্যতে তা আবার ভুলে যায়। কিন্তু যে কথা তারা নিজেরা বলে সেগুলি তার কাছে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ভাষাশিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া। স্বাভাবিকভাবে যেমন করে ভাষা শিক্ষা হয় বিদ্যালয়ের পদ্ধতি তাকে অনুসরণ করলে ভাষা শিক্ষা শক্ত ভিত পাবে। ভাষাজ্ঞান বহুভাবে অর্জিত হয়। নিজ মাতৃভাষায় প্রকৃত শিখন হয়।

—ঃ মূল্যায়ন ঃ—

নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য (সাময়িক, তাৎক্ষণিক) যে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার, তা হল—

1. পাঠদানের (টিচিং-লার্নিং প্রসেস) পূর্বে যে সকল সামর্থ্য চিহ্নিত হয়েছে সেই সামর্থ্যগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বা ভিত্তি করে মূল্যায়নের অভীক্ষা তৈরী করতে হবে। অভীক্ষাগুলি লিখিত, মৌখিক ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে করা যেতে পারে।

2. অভীক্ষার ভাষা সহজ স্বচ্ছ ও বোধগম্য হতে হবে। কাজকর্মের নির্দেশনাও শিক্ষার্থীদের উপযোগী হতে হবে।

3. বিজ্ঞানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাজকর্মের উপরই অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

4. মূল্যায়নের পরে যদি দেখা যায় যে, কোন সামর্থ্য অর্জন করানো গেল না, তাহলে তার কারণ কী, অনুসন্ধান করতে হবে এবং তার সমাধানের জন্য সংশোধনী পাঠ-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

5. মূল্যায়ন করার পর অনেকসময় দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী যারা চিহ্নিত সামর্থ্যগুলি সহজেই আয়ত্ত করতে পারছে, তাদের ঐ সামর্থ্যগুলি আরও সমৃদ্ধ করার জন্য আরও উন্নত মানের কর্মব্যবস্থার (Activity) উদ্ভাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে পড়ল তাদের জন্য প্রয়োজনীয় Activity-র ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যাতে তারাও প্রয়োজনীয় সামর্থ্যগুলি শেষ পর্যন্ত অর্জন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে (শিক্ষক/শিক্ষিকা) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর রাখতে হবে।

- কোন পাঠে কী সামর্থ্য আছে তা ঠিকভাবে চিহ্নিত করা।
- সামর্থ্যগুলি অর্জন করানোর ক্ষেত্রে কী কী জীবনকেন্দ্রিক, সক্রিয়তা ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় তা ঠিক করতে হবে।
- মূল্যায়নের প্রশ্নগুলি শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত, তা না হলে শিখন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংগতি থাকবে না।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সামর্থ্যের নির্দ্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে দিতে হবে।
- মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীকে কোন গ্রেড বা শংসাপত্র দেওয়া নয়, তার শিখন ধারাকে উন্নত করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। এরজন্য প্রয়োজন বোধে আরও বেশী পরিমাণে দুর্বলতা নির্ণায়ক অভীক্ষা এবং পরিপূরক শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশেষভাবে বলা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নে একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে অপর শিক্ষার্থীর তুলনা সবসময় প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত কোন শিক্ষার্থী সামর্থ্যভিত্তিক শিক্ষা লাভ করতে পারল কিনা।

অতএব দেখা যাচ্ছে—

- প্রথমটি হচ্ছে –Normative testing (মান-নির্ণায়ক)
- দ্বিতীয়টি হচ্ছে—Criterion referenced testing

বলাবাহুল্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান।

—

ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ইভ্যালুয়েশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ কর্তৃক মুদ্রিত।